রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী পত্র ালাপ

সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

আসাম-গৌরীপুরের বড়ুয়া রাজাদের দেওয়ান দ্বিজেশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। শারীরিকভাবে ক্ষীণজীবী, মানসিকভাবে কিছুটা নিঃসঙ্গ প্রকৃতি ও অন্তর্মুখী মানুষ ছিলেন তিনি। আপনমনে কবিতা লেখা, দেশবিদেশের খ্যাতিমান লেখকদের সঙ্গে পত্রালাপ করা ছিল তাঁর স্বভাবজাত। সব মিলে মানুষটি ছিলেন কিছুটা আপনভোলা।

আকস্মিকভাবে ভীষণ এক আঘাত পেলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা অণচন্দ্রের আত্মহত্যায় (৯ এপ্রিল ১৯১৭)। অণ ছিলেন 'উজ্জ্বল সুন্দরশ্রী যুবা, সাহিত্যের দেশী-বিদেশী প্রাঙ্গণে তাঁর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল'— কনিষ্ঠভ্রাতার সাহিত্যজগতে প্রথম প্রবেশের দ্বার তিনিই দেখিয়েছিলেন। তাঁরই মৃত্যুতে অমিয় চক্রবর্তীর জীবনের মোড় গেল ঘুরে। নিদাণ এক হতাশা ও শূন্যতাবোধে তিনি মানসিকভাবে অবসন্ন হয়ে পড়লেন। মনের শান্তির আশ্রয় খুঁজতে তখন পত্রযোগে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সমবেদনা জানিয়ে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তা তাঁকে সান্ত্বনাই শুধু দেয় নি, মানসিক শক্তিও দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'মৃত্যু তোমার যা হরণ করেচে তার চেয়ে বড় করে পূরণ কক। ....বেদনার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক্।' 'চিঠিপত্র' একাদশ খণ্ডের এই দ্বিতীয় পত্রটি অমিয় চক্রবর্তীর জীবনকে নতুন আশায় ও উদ্দীপনায় বুক বাঁধতে শক্তি দিল। এর পর থেকে উভয়ের মধ্যে পত্রালাপ নানাভাবেই চলেছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইতিপূর্বে ১৯১৬ সালে ষোলো বৎসর বয়সে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস পড়ে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখেছিলেন— এটিই তাঁর প্রথম চিঠি রবীন্দ্রনাথের প্রতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বয়স্ক ব্যক্তি মনে করেই উত্তর লেখেন 'বিনয়সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন— আমার 'ঘরে-বাইরে' গল্পটি আপনাদের ভাল লেগেচে এতে আমি বিশেষভাবে আনন্দল াভ করেচি (১২ মার্চ ১৯১৬)।' স্বাভাবিক সাহিত্যপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সমালোচনার ঝোঁকও যে অমিয় চক্রবর্তীর ছিল তা তাঁর প্রথম পত্রটি থেকেই প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর পত্রালাপের সূচনা ১৯১৬ সালে। তার পর দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে (১৯১৬-১৯৪১) এই ধারা চলেছে অব্যাহত। পত্রগুলি শুধুমাত্রই ঘটনা বা তথ্যে ভারাক্রান্ত নয়, পরন্তু উভয়ের জীবনবৃত্তান্তের মননশীল বিভিন্ন উপাদানে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তদানীন্তন বহু জ্ঞানতাপস ও কবির পত্রবিনিময় হয়েছিল। কিন্তু যে-কোনো ক ারণেই অমিয় চক্রবর্তীর মতো আর কারো সঙ্গেই এত সুদীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিকভাবে পত্রালাপের নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই পত্রালাপ রবীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর সম্পর্ক নিবিড় গভীর ও বহু বিস্তৃত রূপ নেয়। বয়সের ব্যবধান চল্লিশ বছরের হলেও অমিয় চক্রবর্তী শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব ছিলেন না, ছিলেন নিত্যসঙ্গী, বন্ধু, পরামর্শদাতা তথা সমালোচক। অমিয় চক্রবর্তীর স্বকীয়তা কীভাবে ধীরে ধীরে বলিষ্ঠরূপ নিল, রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে থেকেও তিনি কীভাবে হয়ে উঠলেন কবি ও চিন্তাবিদ্ অমিয় চক্রবর্তী তার ইতিহাসও রয়ে গেছে তাঁদের পত্রাবলীতে। ক্রমশ গড়ে ওঠা ও বহু বিস্তৃত র ূপ নেওয়া এই সম্পর্ককে একটি বিশেষ পর্বে সীমায়িত করা কঠিন। তাই বর্তমান আলোচনায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পত্রের সন্ধ ান করব— যেখানে উভয়েই তাঁদের অন্তর সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন পরস্পরের নিকট, নানা বর্ণনায় বা প্রস্তাবে উজাড় করে দিয়েছেন একে অপরের কাছে। এর ফলে আলোচনায় প্রসঙ্গগুলিই বড়ো করে দেখা হয়েছে। কালক্রম বজায় রাখার প্রচেষ্টা করা হয় নি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম পরিচয় পত্রে, সাক্ষাৎ হয় পরে, প্রমথ চৌধুরীর গৃহে। তাঁর সেই প্রথম দেখার বিস্ময় ও মুগ্ধতা লিখিত রূপে পাই এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে। তিনি বলেছেন, 'সত্যি মনে হয়েছিল তিনি দেবলোকের

অধিবাসী। কথায় হাসিতে বেশে ব্যবহারে একটি সহজ অলৌকিকত্ব তাঁকে ঘিরে থাকত। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর এই দিব্যভাব জেনেছি। কোনোদিন তা প্রাত্যহিক পরিচয়ে ম্লান হয়নি।... পরে তাঁর সস্নেহ আহবানে একবার শান্তিনিকেতনে গেলাম... আমার জীবনের সম্পূর্ণ একটি নূতন অধ্যায় খুলে গেল।' শান্তিনিকেতনে প্রতিদিনের যে জীবন ব্যাপ্তি তাতেই তিনি পেলেন মুক্তি। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি 'আমার ঝিপথিকবৃত্তির পথ অভাবনীয় দিগন্তের সন্ধান পেল।... রবীন্দ্রনাথ আমাকে কোনো উপদেশ না দিয়ে কোনো রকম প্রতিষ্ঠানিক ধর্মমত বা অনুষ্ঠানে জড়িত না করে মুক্তির নির্দেশ দিলেন।'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর কিছুদিন পর অমিয় চক্রবর্তী হাজারিবাগের সেন্ট কলাম্বাস কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানকার পরিবেশে তিনি নিজেকে কিছুটা সামলে নিতে পেরেছিলেন। এ সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পত্র লেখেন, তাঁর মন যাতে বিশ্বের বৃহৎ ও বিচিত্র কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তার জন্য বারে বারে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন। 'চিঠিপত্র' একাদশ খণ্ডের প্রথম দিককার পত্রগুলি অমিয় চক্রবর্তীর চিত্তকে গড়ে তোলার ইতিহাস। হাজারিবাগ কলেজ হস্টেল থেকে অমিয় চক্রবর্তীও মাঝে মাঝে পত্র লিখতেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর প্রেরণায় ও উৎসাহ বাণীতে শান্তি লাভ করে মনের নিভৃত বাণীগুলি প্রেরণ করতেন। অন্তরের সুর- ঝংকার গান হয়ে উৎসারিত হত তাঁর হৃদয়ের দুয়ারে। ছোটোবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি তিনি আকর্ষণ অনুভব করতেন। গৌরীপুরের পালাপার্বণ, মাঝি-মোল্লার গান, বাউল-কীর্তন প্রভৃতি সবরকম লোক-সংগীতের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন বাল্যকালে। পরে কলকাতায় মাতুলালয়ে য়ুরোপীয় ও মার্গ সংগীতের সঙ্গে গভীর পরিচয় হয়। রাশিয়ার গান, জার্মানির গান, শ্রেষ্ঠ সংগীতকারদের পিয়ানো, ভায়োলিন অর্কেস্ট্রা, সঙ্গে ভারতীয় মার্গসংগীত শুনতেন রেকর্ডে। ইমদাদখানের সুরবাহারে জৌনপুরী টোড়ি তাঁর চৈতন্যের গভীরতম স্থলে ঝংকৃত হত। নিজেও ছোটো ছোটো গান লিখে সুর দিতেন। তাঁর মতে সেগুলি ছিল 'রবীন্দ্রনাথের গান ও গীতসাহিত্যের দুর্বল প্রতিচ্ছায়া।' উনিশ বছরের সেই ছেলেটি ২০.১১.২০ তারিখে হস্টেল থেকে কবিকে এক পত্র লিখে সঙ্গে পাঠালেন কয়েকটি গান। প্রথম ঝিযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বের অশান্তি তথা দেশে নন্-কোঅপারেশনের উন্মাদনা সহ্য করতে না পেরে একটু শান্তির আশ্রয় খুঁজেছিলেন গানগুলির মধ্যে। আর তাঁর সমব্যথী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন প্রৌঢ় কবি রবীন্দ্রনাথকেই।

এইভাবেই ক্রমে শু হল তাঁর 'আত্মগুহান্ধকার' থেকে বেরিয়ে আসার পালা। এর কিছুকাল পরে তিনি আত্মনিবেদন করেন রবীন্দ্রপদপ্রান্তে, শান্তিনিকেতনের পুণ্যভূমিতে। তাঁর কবি হয়ে ওঠার যে ইতিহাস তার প্রথম দিকে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনটাকে 'বাজে' মনে করে তিনি অবহেলা করতেন। সেক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উপদেশ দিয়ে লেখেন (পত্র ২০) 'এই বাজে জগৎটা জগতের পনেরো আনা অংশ। বাকি জগৎটাতে আর্টিস্টের দল নির্বাসিত।... তোমাকে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে... তাতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না— ভালই হবে— মজবুৎ হয়ে উঠবে।' তার পর থেকে অমিয় চক্রবর্তী সারাটা জীবন মজবুৎ হয়ে ওঠার চেষ্টা ছাড়েন নি। তাঁর কবিতার মধ্যে মসৃণতাকে, পেলবতাকে প্রবেশ করতে দেন নি। তাঁর কবিজীবনপ্রকৃতি রবীন্দ্র-অনুগামী না হলেও তাঁর হৃদয়সহগামী হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে আসার পর ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথও যে তাঁর প্রতি কতখানি আস্থাশীল হয়েছিলেন তার পরিচয় যেমন রয়েছে কনিষ্ঠ কবিকে লেখা কবিতাগুলিতে, তেমনি রয়েছে পত্রাবলীতে। নির্দ্বিধায় তিনি তাঁর উদ্দেশে বলতে পেরেছিলেন—

'আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে সে আলোক যায় মিলে।'

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর সান্নিধ্য ক্রমে হল নিকট থেকে নিকটতর। ১৯৩০ সাল থেকে বেশ-কিছুকাল পৃথিবীর নানাস্থানে কবির ভ্রমণসঙ্গী হলেন, অসংখ্য অভিজ্ঞতাও অর্জন করলেন।

১৯৩৩ সালে অমিয়বাবু দেশ ছেড়ে গেলেন, ছেড়ে গেলেন শান্তিনিকেতন। হয়তো দূর থেকে রবীন্দ্রনাথের আরো কাছে আসাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বিচ্ছেদকে যিনি একদা বিশ্বের রথযাত্রার অনুগামী বলে মেনে নেবার উপদেশ দিয়েছিলেন সেই প্রবীণ কবিই হলেন একান্ত বেদনাকাতর। তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে চিঠি লেখেন, 'তোমার সঙ্গে এমন একটা নিবিড় যোগ হয়ে গিয়েছিল যে এ বয়সে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়।' কিন্তু তার পরেই নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বলেন যে, 'তণ জীবনকে' আঁকড়ে থাকাটা অন্যায়। অতএব 'স্বাধীনতার মুক্ত আলোকে মনের পূর্ণ বিকাশ লাভ করে' ধন্য হবার আশীর্বাদ জানান। অমিয় চক্রবর্তীর বিদেশ যাত্রার পর থেকে উভয় কবির পত্রালাপের পর্যায়গুলি নানা চিন্তার

প্রেক্ষিতে আরো অনেক গুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। দূরে থেকে তাঁদের আত্মিক সম্পর্ক হল গভীরতর।

'চিঠিপত্র' একাদশ খণ্ডের ১১০ ও ১১১-সংখ্যক পত্র দুটিতে (১৭ মার্চ ও ১১ এপ্রিল ১৯৩৯) চিঠির চরিত্র কী সে বিষয়ে আলোচনা করতে করতে একটি সমালোচনা প্রসঙ্গ তোলেন রবীন্দ্রনাথ। বলেন 'বাঁধা পথ নেই চিঠির... একটা সাহিত্যের তর্ক তুলব তোমার সঙ্গে, এই কথা মনে করেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলুম।' এ চিঠির প্রধান বিষয় ছিল সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মনন- প্রধান প্রবন্ধের বই 'স্বগত'। এই আলোচনা ছিল প্রায় 'রিভিউ-পর্যায়ের'। কিন্তু রূপটি চিঠির, আলাপ করার ধরনে। অমিয় চক্রবর্তী ১১০ নম্বর চিঠিটির উত্তরে (২৩ মার্চ, ১৯৩৯) জানান, 'চিঠির আকারে সাহিত্যের এমন একটি র ূপ সৃজিত হয়ে উঠচে যার তুলনা কোথাও নেই। কাব্য, ডায়েরি এবং গদ্য প্রবন্ধের আলো এসে পড়ে অথচ চিঠির বিশেষত্ব একটুও কমেনি'—। অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের ১১১ নম্বর চিঠির উত্তরে (১৭ এপ্রিল, ১৯৩৯) 'স্বগত' বইটির প্রসঙ্গে তীক্ষ্ণভাষায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক বিতর্কের অবতারণা লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে 'সবুজ পত্রে'র সঙ্গে। বলেছেন, 'সবুজ পত্রে প্রাণের সবুজ রং ছিল, পরিচয়ে অতন্ত বুদ্ধির পরিচয়, প্রাণের নয়।... সুধীনবাবুর লেখা পড়ে আনন্দ পাই কিন্তু কোথায় একটু অভাব থেকে যায়।'

সাহিত্য-আলোচনা বিষয়ে আর-একটি দীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত হয় রবীন্দ্রনাথকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর একটি চিঠি থেকে (মার্চ ১৯২৫)। ডাক্তার-সাহিত্যিক হ্যাভলক এলিসের সঙ্গে তণ বয়স থেকেই অমিয়বাবুর পত্রালাপ ছিল। রবীন্দ্রন াথকে এলিস বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলেই মান্য করতেন। তবুও ১৯২৫ সালে এক পত্রে তিনি রবীন্দ্রকাব্য বিষয়ে এক বিশেষ অতৃপ্তির কথা জানান অমিয়বাবুকে। সে অতৃপ্তি হল, এই মহাকবির কাব্যে গ্রামজীবনের চিরন্তন বিচিত্র কথা অ াছে, কিন্তু বিজ্ঞানও যে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার স্বীকৃতি নেই কেন? এই ধরনের জিজ্ঞ াসা হয়তো এর আগে রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে আর ওঠে নি। ওই চিঠি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করলে তিনি তাঁর অনুপম ভাষায় উত্তর দিলেন চিঠিপত্র একাদশ খণ্ডের ৩১ নম্বর চিঠিতে (২৮ মার্চ, ১৯২৫)। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়ে াগের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর যে সিদ্ধান্ত তা এইরূপ ....সেখানে স্থূলকে দেখি, অনির্বচনীয়কে দেখি নে তো। তাই বাহবা দিই, কিন্তু সেই বাহবায় ছন্দ আসে না।... বিজ্ঞান যেখানে পরমাণুর পরমতত্ত্বের সাম্‌নে আমাদের বিস্মিত মনকে দাঁড় কর ায় সেখানে চরমকে দেখি— আমি সেই চরমের বন্দনা করেছি।'

অমিয় চক্রবর্তী কবির এই অভিমত সানন্দেই মেনে নিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি জানান (১ এপ্রিল, ১৯২৫) 'আপনি যা বহুব ার বলেছেন, পাশ্চাত্যদেশ তার নবলব্ধ শক্তিকে সামলাতে পারছে না... অর্থাৎ যেটা হওয়া উচিত উপায় মাত্র, নেশার ঘে ারে তাদের কাছে সেইটেই অন্তিম হয়ে দাঁড়ালো... আশ্চর্য এই যে আপনি কেমন করে' অত আগেই 'মুক্তধারা'য় হুবহু এই মনোভাবের প্রকৃত চেহারা ধরে' দিয়েছেন! 'নমো যন্ত্র'-এর মত গান বাঁধা অবশ্য ওদের কার সাধ্য নেই, কিন্তু ওদের যন্ত্রের পূজা তা বৈ আর কি?' রবীন্দ্র-মানসিকতাকে স্বীকার করে নিলেও তাঁর মনের মধ্যে একটা প্র শ্ন থেকে গেল। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব পুরোপুরি স্বীকৃতি পায় নি অমিয় চক্রবর্তীর কাছে। নানা প্রবন্ধে, কবিতায় তার সাক্ষ্য রয়েছে। প্রথম কবিতার বই 'খসড়া'য় (১৯৩৮) দেখা গেল অনেকগুলি কবিতারই প্রসঙ্গ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথের অভিমত ও আশীর্বাদ চেয়ে বই-এর কপি পাঠিয়ে দিলেন। প্রস্তাব থাকল বিজ্ঞানজ্বালা অধ্যাত্ম শক্তিও কাব্যে দেখা দিতে বাধা নেই। প্রস্তাবটি কঠিন। কবিতাগুলি কবির ভালো লাগছে, আবার কোনো কোনো কবিতার সার্থকতা স ম্পর্কে সন্দেহও আছে।

'খসড়া'র পরে 'একমুঠো'তেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিকের যে চেহারা দেখলেন তা তাঁর অনুমোদন ও প্রশংসা লাভ করল। অব্যবহিত কাল পরেই 'প্রবাসী'তে অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের রবীন্দ্র-কৃত আলোচনা প্রকাশ হয়—'নবযুগের কাব্য'। এইসব আধুনিক কাব্যে 'বেশের বদল করেও যদি কাব্যই অবির্ভূত হয় তাকে অভ্যর্থনা করতে' কবির দ্বিধা ছিল না। তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর নিজের 'কবিতা-ব্যূহ' থেকে আধুনিক কবিরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই 'বিদ্রোহ'কে তিনি অভ্যর্থনা করেছেন। বলেছেন 'আমি আনন্দ পেয়েছি অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে।... বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে আছে এর সঞ্চরণ।' কবির এই দুই কাব্য-সমালোচনার সূত্র ধরে আমরা দেখি রবীন্দ্রমননে সমৃদ্ধ হয়েও অমিয় চক্রবর্তীর স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার ছবি। যাই হোক, নব চিন্তাকে অনুমোদন করলেও বিজ্ঞান ও কাব্যের সম্পর্ক নিয়ে উভয় কবির মধ্যে চলেছিল দীর্ঘ তর্কবিতর্ক ও আলোচনা। হ্যাভলক এলিস প্রসঙ্গটির উত্থাপন মাত্র করেছিলেন। তার পরে তিনি সরে গেলেন। কিন্তু এই

দুই কবির পারস্পরিক আলোচনায় বহুদিন পর্যন্ত রয়ে গেল তার প্রতিধ্বনি।

বিদেশে অমিয় চক্রবর্তীর কাছে নিজের লেখা পাঠিয়ে দিতেন কবি, জানতে চাইতেন তাঁর অভিমত। বিষয়গুলি নিয়ে পত্রে চলত তাঁদের আলাপ-আলোচনা। কনিষ্ঠের প্রতি কবি তাঁর স্বাভাবিক অধিকারবোধ থেকেই লিখেছেন (২৩ অক্টোবর, ১৯৩৪)—'টমসন গোরা দ্বন্দ্বন্ধ করতে রাজি। তার সঙ্গে এ নিয়ে মোকাবিলা কোরো। তাকে সঞ্চয়িতা ও পুনশ্চ এক কপি দিয়েছি। সেই সঙ্গে চার অধ্যায়। ওটা একটু হাত চালিয়ে শেষ করতে পারো যদি ভালো হয়।... আমার সমস্ত ইংরেজি কবিতাগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে ছাপাবার প্রস্তাবটা ভুলো না। ইয়েট্‌স্ কিম্বা কোনো কবির সাহায্য নিয়ে বাছাই করা ভালো।'

৪ মে ১৯৩৫ তারিখে লিখছেন—''শেষ সপ্তক'' বলে নতুন কবিতার বই আমার জন্মদিনে বেরবে।... তাই নিয়ে মন হয়ে আছে গুঞ্জরিত। চার অধ্যায় দেখবার সময়ই পাই নি।' এর পরের চিঠিতেই লিখছেন (২৬ জুন ১৯৩৫) 'এতদিনে চার অধ্যায়ের কৃত তর্জ্জমা আমাদের শেষ হল। তুমি ইংরেজি পাঠকের দিকে তাকিয়ে অনেকটা বদল সদল করেছ— তাতে বাঙালী পাঠকদের প্রতি অবিচার করা হয়।... ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের ওখানকার উপদেষ্টারা যদি আধুনিকতার প্রলেপ দিয়ে দেন সে ভালোই, কিন্তু ভাব বদলানো সঙ্গত হবে বলে মনে করি নে।'

চার অধ্যায়ের অনুবাদ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তীর পত্রালাপ ও পরিকল্পনা অনেকদিন ধরে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর প্রেরিত অনুবাদটি পড়েন ও সংশোধন করেন। প্রকাশকদের সঙ্গে ছাপাবার কথাও হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে বই-এর রঙিন মলাট এঁকেছিলেন। কিন্তু শেষে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই অমিয় চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদটি প্রকাশ স্থগিত হল। সম্ভবত অমিয় চক্রবর্তীর অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রেই আক্ষরিক ছিল না বলেই কবি ওই অনুবাদটি প্রকাশযোগ্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। অপরদিকে, কবির এই সিদ্ধান্ত অমিয় চক্রবর্তীরও মনঃপূত হয় নি।

'শেষ সপ্তক' পড়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে অক্সফোর্ড থেকে অমিয়বাবু লেখেন (৯ জুন, ১৯৩৫) 'সমস্ত আকাশ রঙে ভরে উঠেছে, সব রাগিণী বেজে উঠেচে, দিগন্তে দিগন্তে ভাবে কল্পনায় ভাষার ধ্বনিতে ছবিতে মহাসৃষ্টির কবিতা এই শেষ সপ্তক।'

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটি কবি অমিয় চক্রবর্তীকেই উৎসর্গ করেন। বিদেশে ওই গ্রন্থ পেয়ে অমিয়বাবু কতখানি চমৎকৃত হয়েছিলেন তারও পরিচয় রয়েছে উদ্‌ধৃত উক্তিতে (১০ নভেম্বর, ১৯৩৬)—'' 'সাহিত্যের পথে' পেয়ে অবধি কী রকম আনন্দে আছি বলতে পারি না, বিদেশের জীবন হঠাৎ আলো হয়ে উঠল।... 'সুন্দর' কথাটা লোকে ঠিকভাবে ব্যবহার করে না ব'লেই আপনার মনোভাব সম্পূর্ণ ধরতে পারেনি আশা করচি এবারে আপনার রচনা পড়ে মহা-আধুনিকেরাও চোখ খুলে দেখবেন।'' এই পত্রালোচনায় দেখা যায় 'সুন্দরতত্ত্ব', 'সাহিত্যসৃষ্টিতত্ত্ব' প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রঋণ অবলীলায় স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি।

১৬ মার্চ, ১৯৩৭ তারিখের চিঠিতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অল্পদিন আগে লেখা এবং তাঁরই অঙ্কিত অভিনব স্কেচ ও রঙিন চিত্র ও প্রচ্ছদ -সহ 'খাপছাড়া' বই-এর প্রাপ্তিসংবাদ এবং সমালোচনামূলক আনন্দপ্রকাশ। বলেছেন—'এরকম আশ্চর্য্য জিনিষ কল্পনা করতে পারি না। সাহিত্য সৃষ্টির কোনো প্রচলিত পর্য্যায়ে এর স্থান দেওয়া চলবে না।—'খাপছাড়া' সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র; ছবিতে, স্বপ্নে, অদ্ভুতে, রহস্যে, রসে, রসিকতায় প্রহসনে জ্বলন্ত নূতন জগৎ নিয়ে দেখা দিল।... এখানকার আর্টিস্ট ও সাহিত্যিকদের ছবি দেখাব— আর কিছু না বুঝলেও ছবির ভাষায় চমৎকৃত হবে।' খাপছাড়া সম্বন্ধে এত সংক্ষিপ্ত অথচ এমন যথার্থ সমালোচনা বোধহয় আর হতে পারে না।

১৯৩৯ সালের মে মাসে 'আকাশপ্রদীপ' গ্রন্থ পেয়ে অমিয়বাবু জানান— সম্পূর্ণ নূতন সুরের গ্রন্থ এটি। 'পূরবীর ছোঁওয়া রয়েচে অথচ সাম্প্রতিক হাওয়ার ছন্দ।' তিনি মনে করেন 'অনুকরণের বন্যা বইবে কিন্তু কেউই সম্পূর্ণ পৌঁছতে পারবে না।' তিনি ওই কবিতাগুলি অবলম্বন করে ইংরেজিতে লেখার সংকল্প কবিকে জানান। তিনি অনুভব করেছেন আসন্ন যুগের ছন্দ ও ভাবে কবিরা রবীন্দ্রনাথেরই অনুবর্তী হবেন, অথচ তা হবে না ঠিক রাবীন্দ্রিক। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের লেখা যখন যেরকম প্রকাশ হয়েছে তখনই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন অনুজ কবির কাছে এবং তিনিও সেগুলি পেয়েই তাঁর মন্তব্যসহ পত্র প্রণ করেছেন। শুধু তাই নয়, বিদেশে কবির কবিতা, নাটক, গল্প, গদ্যের সংকলন ও প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বেচ্ছায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নি।

ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়েও উভয় কবির মধ্যে গভীর চিন্তামূলক আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায় পত্রাবলীতে। রাজনৈতিক সমস্যা-সংকটের দিনে রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, মতামত চেয়েছেন সমস্যার নিরসনের জন্য। কারণ তাঁর মতে অমিয়বাবুর অভিজ্ঞতার পরিধি অনেক বিস্তৃত। অমিয়বাবুও তাঁর ঝিরাজনীতি জানার অভিজ্ঞতা থেকে কবিকে পত্রে জানিয়েছেন অভিমত। আধুনিক সভ্যতার সংকট রবীন্দ্রনাথের মনকে বার বার আলোড়িত করেছে। কবি দুঃখ করে লিখেছেন, যাদের 'জয়দৃপ্ত ইতিহাস' ও 'স্বাধীন কর্তৃত্বের গৌরবকে' আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছি সেই য়ুরোপেরই 'তামসিক মনোবৃত্তির সাংঘাতিক চেহারা' আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের মঞ্চেও এর 'ছোঁয়াচ লেগেছে' (১৭ মার্চ ১৯৩৯)। উত্তরে অমিয় চক্রবর্তীও তৎকালীন রাজনৈতিক দলের মনোভাব সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ কবির কাছে জানান (পত্র ৭৬)।

অপরপক্ষে, মানুষের ইতিহাসের মধ্যে মানুষেরই গৌরবময় আত্মপ্রকাশ দেখেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী হারাপ্পায় গিয়ে। মন তাঁর আত্মতুষ্টিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে লিখিত পত্রে (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮) সেই গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণনা যেন কবিতারূপে উচ্ছ্বসিত হয়েছে।—'কত যুগের প্রাচীন দিন তার ভাঙা খেলনা, নামের অচেনা অক্ষর ফেলে রেখে দিয়ে গেছে।... কি আশ্চর্য্য কাজ-করা প্রাক্-সুমেরীয় মূর্ত্তি, গহনা, ধুলোর স্তরে পড়ে আছে; সুন্দর মাটির বাসনে নিভৃত সংসারের সুর লেগে রয়েচে।... তাদের কালের সেইদিনের মালা অশ্রুতে হাসিতে মিলে আমাদের মনের মধ্যে জাগল— যা দেখলাম তার মধ্যে কালের পরিমিতি নেই।' ইতিহাসের মধ্যে থেকে সমবেত মানবাত্মার প্রাণের বাণীকে কবি যেন অনুভব করলেন। তাঁর এই পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রপত্রেও এই অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮)—'মানুষ যে একদিন বেঁচে ছিল, তার সহজ জীবনযাত্রার প্রতিদিনের সঙ্গে আপনার চারিদিককে নানা রকম করে মানিয়ে নিয়ে তাতে আপন নানা রকম স্বাক্ষর দিয়েছিল এইটে যখন দূরকালের ভিতর দিয়ে অনুভব করা যায় তখন আনন্দ হয়।... প্রাণের কাছে প্রাণের বাণী আশ্চর্য্য!'

আবার মানুষেরই হাতে বিঘ্নিত হয় মানুষের সামগ্রিক ইতিহাস। অক্সফোর্ডে বসে বিধবস্ত আফ্রিকার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে দুঃখ প্রকাশ করেন (২০ এপ্রিল ১৯৩৭)—'কত দুঃখের মধ্যে দিয়ে মানুষের জাগরণ। কিন্তু এই জাগরণও কি বেশিদিন থাকে? আবার ঘুম আসে, যুগ যায়, দুঃস্বপ্নের তাণ্ডবের মধ্যে মিথ্যা লেলিহান হয়ে ওঠে।' সর্বনাশা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন ক্রমশ আসন্ন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লিখে তিনি তাঁর 'ঘুম' কবিতাটি জুড়ে দিলেন— 'ঘুমের আকাশে রাত্রি আসে, দিন, তন্দ্রার উজ্জ্বল সূর্যফুল।' কবিতাটি গূঢ় অর্থপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ এর অসাধারণ বিশ্লেষণ করেছেন 'চিঠিপত্র' একাদশ খণ্ডের ১২১ নম্বর পত্রে (৬ অক্টোবর ১৯৩৯)। এই কবিতার বিষয়টি কয়েকমাস পর্যন্ত কবির হৃদয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে ছিল। পাঁচমাস পরে (২৮ মার্চ ১৯৪০) অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার উত্তর এল এক কবিতা হয়ে—'রাতের গাড়ি' ('নবজাতক' "এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি")। এ গাড়ি গন্তব্যবিহীন নয়, অচেতন থাকলেও নিদ্রিত যাত্রীর মনে 'কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা' জেগে থাকে। ইতিহাসের চাকা কখনোই থম্‌কে থেমে থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তীর পত্রগুচ্ছের শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করব 'ধূলি' ("বাণীর মন্দির গড়ি") নামে একটি কবিতার রচনা-প্রসঙ্গ। কবিতাটি 'ধূলি' শিরোনামে কোনো গ্রন্থে নেই। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ লেখা' গ্রন্থের অন্তর্গত ৯-সংখ্যক কবিতা। শান্তিনিকেতনে উদয়ন গৃহে কবিতাটি রচিত, ৩ মে ১৯৪১ তারিখে। চট্টগ্রামে অমিয় চক্রবর্তীর মামা সোমনাথ মৈত্র -আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের ৮০ বছরের জন্মদিন ধুমধাম করে পালন করবার জন্য তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে গেলেন। অনুষ্ঠানে পাঠের জন্য কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেন একটি কবিতা, তারই নাম "ধূলি"। কবিতায় কবি লিখেছেন—

"পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে
শান্তি পায় শেষে
আবার ধূলিতে যবে মেশে।"

৬ মে ১৯৪১ তারিখের চিঠিতে অমিয়বাবু কবিকে লিখেছেন, "'ধূলি" কবিতাটি অপূর্ব লাগ্‌ল। কিন্তু জন্মদিন উপলক্ষ্যে এটা পড়লে এর অন্তর্নিহিত বেদনা সকলকে বাজ্‌বে এবং আপনার বাণীর মূরতি নির্জন প্রাঙ্গণে আবার ধূলি হয়ে যাবে এ কথা কেউই মান্‌বে না।... সুতরাং আরো একটা কবিতা আমরা চাই।'

তিনি তখন কল্পনাও করতে পারেন নি—“ধূলি” কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পাওয়া তাঁর শেষ উপহার; ওই বছরেরই ২২ শ্রাবণ তখন আসন্ন, কবির লেখনী হয়ে যাবে স্তব্ধ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপের এখানেই ঘটবে সমাপ্তি।

সূত্র

‘চিঠিপত্র ১১’।। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, আষাঢ় ১৩৮১

‘কবির চিঠি কবিকে’।। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাবলী। প্যাপিরাস, জানুয়ারি ১৯৯৫

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com